বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তগর্ত এস. ই. সি. টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র : - মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবতাবাদ

শিক্ষার্থীর নাম : - সোমাশ্রী মাইতি

সেমিস্টার : - চতুর্থ

পত্র : - এস. ই. সি. -টু

রেজিস্ট্রেশন নং - ২১১০৪০২৪৭ , ২০২১ - ২০২২

রোল নং - ১১১৪১৫২ - ২১০০২২

শিক্ষাবর্ষ : - ২০২২ - ২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Somashree Maity Roll: 1114152 No: 210022, Reg.No:- 3110 40247 of 2021-2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Dr. Ra...n Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-7216..

Supervisors

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.: Nandigram, Purba Medinipur, Pin- 721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা	১ — ৩
২	প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন	৪
৩	বিষয় পর্যালোচনা	৫ — ৬
৪	বিষয় আলোচনা	৬ — ২৬
৫	উপসংহার	২৮ — ২৯
৬	সিদ্ধান্ত	৩০
৭	গ্রন্থপঞ্জী	৩১
৮	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩২

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা

(ক) প্রকল্প কাকে বলে?

=> কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।

(খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী?

=> প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি হল ——

(I) সমস্যা কেন্দ্রিক :-

প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(II) উদ্দেশ্য ভিত্তিক :-

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(III) অভিনবত্ব :-

প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়।

(IV) সৃজনশীলতা :-

প্রকল্পমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়।

(V) অনুসন্ধানমূলক কাজ :-

প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধানমূলক কাজের মধ্য দিয়ে যেতে

(vi) বাস্তবতাকেন্দ্রিক :-

প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোন না কোন বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে,

(vii) সামাজিক গুনাবলির বিকাস :-

প্রকল্পমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলি গুলি বিকাশিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে,

(ঘ) প্রকল্প কত প্রকারের হয় ?

=> প্রকল্প সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা —
(১) একক প্রকল্প, (২) দলগত প্রকল্প,

(ঙ) প্রকল্পমূলক কাজের উদ্দেশ্য গুলি কী কী ?

=> প্রকল্প মূলক কাজের উদ্দেশ্য গুলি হল —
(১) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা।
(২) ছাত্র - ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে দলবদ্ধতার মানসিকতার বিকাশ সাধন করা।
(৩) ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা,
(৪) ছাত্র - ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো,
(৫) ছাত্র - ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করা।

(চ) প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা কী ?

=> (১) প্রকল্প রূপায়নের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজকরার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে।

(iii) প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বই বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

(চ) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

=> বর্তমানে প্রতিযোগিতা মূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম। প্রতিটি দেশে এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমাজের অর্থনীতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্র বিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগ হল। — (i) প্রাচীন যুগ, (ii) মধ্যযুগ, (iii) আধুনিক যুগ। এই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনী কাব্য। শাক্তপদাবলী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য প্রাক চৈতন্যযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আমরা দেখি গ্রাম বাংলায় সামাজিক প্রথা হিসেবেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। গ্রামীণ নারীর হৃদয় বেদনার এমন বাস্তবচিত্রই দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অনুবাদ সাহিত্য। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় 'রামায়ন' মহাকাব্যের প্রথম অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। এখানে সীতা চরিত্রে কৃত্তিবাস বাঙালী গৃহবধূর লাজ নম্র সুষমাই ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের জয় ঘোষনার ক্ষেত্রে সবজায়গায় স্থান পেয়েছে মধ্যযুগের আর এক সাহিত্য শাখা হলো মঙ্গলকাব্য ~~চণ্ডীম~~ এই মঙ্গলকাব্যে আমরা বেশি করে মানবতাবাদের পরিচয় পাই — চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু ফুল্লরার লৌকিক জীবন কাহিনীর মধ্যদিয়ে তাদের মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উক্ত বিষয় গুলির উপর গভীরভাবে আলোকপাত করার জন্য আমি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মানবতাবাদের ~~প্রভাব~~ বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পর্যালোচনা

ভূমিকা :—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্য এই হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসকে মনে রাখার ক্ষেত্রে যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি, যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে সবসময় সাল তারিখের শুরু হয় না, আর শেষ ও হয়না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে —

① প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ

② মধ্যযুগ

③ আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- **আদিযুগ** (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)
- **মধ্যযুগ** (ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ)
  - প্রাক চৈতন্য যুগ (ত্রয়োদশ শতাব্দী)
  - চৈতন্যযুগ (ষোড়শ শতাব্দী)
  - চৈতন্যোত্তর যুগ (সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী)
- **আধুনিক যুগ** (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)
  - গদ্য সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব (১৮০০ – ১৮৫০ খ্রীঃ)
  - প্রাক রবীন্দ্র যুগ (১৮৫১ → ১৯০০ খ্রীঃ)
  - রবীন্দ্রযুগ (১৯০০ – ১৯৪১ খ্রীঃ)
  - রবীন্দ্রোত্তর যুগ (১৯৪২ খ্রী – সাম্প্রতিক কাল)

মধ্যযুগ বিশ্লেষণ :—

তুর্কী আক্রমণের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা। মধ্যযুগ বলতে ভারতের ইতিহাসে সাধারণভাবে বোঝায় মুসলমান রাজত্বকাল (১২০৬ খ্রীঃ থেকে ১৭৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত), মনে রাখার মতো যে সচরাচর মধ্যযুগ বলতে 'সামন্ত সমাজের কাল' বোঝায়, কিন্তু ভারতে সামন্ত যুগের সূচনা হয়েছিল কুষাণ রাজত্বে (৩০০ খ্রীঃ – ৫০০ খ্রীঃ)। তার প্রসার রাজপুত

রাজাদের রাজত্বে মোটের উপর (৭০০ খ্রীঃ—১২০০খ্রীঃ) এবং তুর্কি বিজয়ে ১২০০ খ্রীঃ তা পুনরায় হয়। এর প্রথম দিকে শেষ হয় (১৫২৬ খ্রীঃ)। মোগল রাজত্বের শেষদিকে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীঃ থেকে সামন্তবাদী সমাজের ক্ষয় বেড়ে যায়, তা চলে পরবর্তী একশত বছর। এই কালপর্বে রচিত যে বাংলা সাহিত্য তার অনেকটাই ছিল প্রাচীনতর লেখার অনুসরণ। তবে তুর্কি আক্রমণের বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে যে তীব্র আঘাত দেয় তাতে বাঙালী জাতি ও সে জাতির সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপলাভ করে।

এই সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন জানান —

"আর্য - অনার্যদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ধর্ম বিশ্বাস মত আচার ও ব্যবহারগত এবং ভাবধারাগত এই যে সুরভেদ ইহা বিলুপ্ত হইয়া অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠিত হইয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান বন্ধুর অবক। বাংলাদেশে আর্য - অনার্য দুই সুরের পরস্পর মিলনফলে তুর্কী অভিযানরূপে প্রচণ্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করিতেছিল, মুসলমান শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য ও অনার্যের মিলন হইয়া বাঙালী জাতি বিশিষ্ট রূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।"

প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার তুর্কী আক্রমণের ফলে তিনটি অনিবার্য সামাজিক আবর্তনের কথা বলেছেন —

① উচ্চ নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হল,

② পরাজিত হিন্দু সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করতে সচেষ্ট হল।

③ এই তাগিদেই রচিত হল সেকালের বাংলা সাহিত্য।

প্রাচীনযুগে মানবতাবাদ :-

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের মতই বাংলার সেই যুগের কাব্য সাহিত্য ও ধর্মীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের দ্বারা। যেন এবং চর্যার মধ্যদিয়ে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়াই ছিল সাধকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্মকথা সেখানে প্রধান অবলম্বন হলেও সমাজ ও মানুষের কথা সেখানে কম নেই। বাইরের যে অর্থ তার মধ্যে মানুষের জীবনের বহু সুখ-দুঃখ, বেদনা-বিরহ নানা অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের কথা বলা বা মানবতাবাদের কথা বলা সেই সব কবিদের উদ্দেশ্য ছিল না সত্য, কিন্তু রূপকের আড়ালে যে তত্ত্বকথা বা গুরুর দর্শনের সংকেত তারা রচনা করেছিলেন তা তাদের অজান্তেই হয়ে উঠেছিল মানব-জীবন-কাব্য।

চর্যাপদে এটাও জানা যায় যে সেকালের মানুষের মধ্যে উচ্চ-নিম্ন বর্ণীয় ভেদাভেদ, বর্ণ ও ধর্ম তবে ছিল। কাহ্নপাদের একটি পদ থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ-নর-নারীরা শবর, চাঁড়াল, ডোম, শুঁড়ি ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষদের ঘৃণা করতেন —

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥"

চর্যার কবিরা যে নিছু ধর্মের কথা বলেছেন তা নয়,

যে সমাজে তারা বাস করতেন সেখানকার মানুষের জীবন ও তাদের কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে মানবতাবাদ:-

মধ্যযুগের যে বাংলা সাহিত্য তা ছিল যেমন ধর্ম নির্ভর, তেমনি ছিল অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত রসে পরিপূর্ণ। এই সময়ে রচিত পৃথিবীর প্রতিটি সাহিত্যেই যে অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল তার মূল রস ছিল অদ্ভুত রস। কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেবমাহাত্ম্য প্রচার। মানুষ নিজেকে দেবতার সেবক হিসাবেই দেখত। তাই সেই সাহিত্যে প্রধান ছিল দেবতার লীলা। এর মধ্যে এসেছে ধর্মকথা ও পুরাণ কথা। মানুষ তেমনই নির্ভর হয়ে দেব-পূজার মধ্য দিয়েই অসহায়তার কথা বলেছে। কখনো দেবতার কাছে প্রার্থনা করে আবার কখনো দেবতা নিজেই মানুষ হয়ে ওঠেন। এই ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় যে সাহিত্য তা ছিল মানবমুখী সাহিত্য, তবে তা নিরপেক্ষ মানবতাবাদ নয়, দেববাদ নির্ভর মানবতাবাদ।

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের শাখা অনেক গুলি আলোচনার সুবিধার্থে কত গুলি পর্বে শাখা গুলিকে উল্লেখ করলাম —— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, ~~বিদ্যাপতি~~, বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনী কাব্য, শাক্তপদাবলী, আরাকান রাজসভার কাব্য, নাথসাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা, এর মধ্যে আরাকান রাজসভার কাব্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা হল মানবজীবন রস-নির্ভর

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য, বাকি সাহিত্য আখ্যানগুলির মূলে অবলম্বন ও উদ্দেশ্য ধর্মকথা বিশ্লেষণ হলেও, এর মধ্যে কি প্রকারে মানব জীবনরস প্রধান হয়ে উঠেছে তা আমাদের আলোচ্য বিষয়। ——

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য :-

আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য, উচ্চশ্রেণীর ধর্মতত্ত্ব একাব্যটির বিষয় হলেও ধীরে ধীরে নায়ক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পল্লী যুবক হয়ে উঠেছেন। এই কাব্যের জন্মখণ্ডে দেখা যায় কংসবধের জন্য কৃষ্ণ অবতার ——

"সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী,
অবতার করি করে ধরণীতে কেলি।"

কৃষ্ণের পর রাধার জন্ম হয় ——

"কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীকে বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার,
থির হউ সকল সংসার॥"

এরপর পৃথিবীর মাটিতে ধীরে দেবতার মুখ মলিন হয়ে আসে, বাস্তবের রূঢ়তায় কৃষ্ণ চরিত্রের অনেকখানি খেলো হতে দেখে কবি মধ্যে মধ্যে দেবত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী' অর্থাৎ রাধাকে না দেখলেও তার সঠিক সন্ধান বড়ায়িকে বলে দিয়েছে

——

"বকুল তলাতে আছে যে সুন্দরী সতী",
বড়ায়ি রাধাকে বলেছে ——

"যে দেব মনে
মেঘা বাড়াইলে
হঅ বিষ্ণুপুরে সতী",

কৃষ্ণ বহুবার নিজের মুখে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে বলেছে ——

"বেদ উদ্ধারি লৌ
ক্রীড়া সাগর জলে
লীলা এ আমো মুরারি
দৈত্য দলিলৌ
আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী",

কবি ধর্মের আবরণে জীবনের প্রেমকাহিনী রচনা করেছেন, নায়ক এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন, পল্লী যুবক। এই কাব্যে বংশীখণ্ড থেকে শুরু হয়েছে লৌকিক প্রেমের প্রকৃত অভিসার। রাধার প্রেমানুরাগে মনোনিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের জবরদস্তি, জুলুম মনোভাবের মধ্যে কোনোও অমর্ত্য কৃষ্ণ, দেব জগন্নাথকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বংশী খণ্ডের সেই অসাধারণ চরম সুর ও মর্ত্য প্রেমের কাব্যিক মাধুর্য অনিবার্য ——

"কেনা বাঁশী ~~বাএ~~ বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে,
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে",

পরম প্রেমময়ের বংশীধ্বনি শুনে বধূর রাধিকার যে মুগ্ধতা তার মধ্যে ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য নেই। এখানে যে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বেনীমাধব বলাটাই ঠিক হবে। তার উদ্দেশ্যে

বালিকা রাধার উক্তি ——

"অন্তর সুখে এ মোর কানু অভিলাসে"

কৃষ্ণের ভুবনমোহন বাঁশীর সুরে রাধার দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে শিথিল হয়ে যায় ——

"আকুল শরীর মোর বে আকুল মন,
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।"

যাই হোক, ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনার সুযোগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি লৌকিক নর-নারীর জীবনেরই সুখ-দুঃখ, হৃদয়ের সংবেদন - প্রসাধন, যন্ত্রণা, আনন্দানুভূতি বর্ণনা করেছেন। এই জন্যেই মধ্যযুগের এই কাব্যটির মধ্যে মানব ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য ধারা :-

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অনুবাদ সাহিত্য। এই যুগে বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' মহাকাব্যের প্রথম অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। এর নায়ক রামচন্দ্রের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি যে ভাবে দেবত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন- কৃত্তিবাস সেদিকে হাঁটেননি। একভাবে এটি বাংলার জীবন-কাব্য। এই গ্রন্থে অযোধ্যার রাজপরিবারের যে মহিমা ম্লান, মহর্ষির হাতে যা ছিল 'মহাকাব্য' কৃত্তিবাসের হাতে তা হয়ে উঠেছিল 'পাঁচালী'। যুদ্ধ নয়, রাজনীতি নয়, বাংলার গার্হস্থ্য জীবন — এর প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(1) রামায়ণ :-

কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র মহর্ষির নায়কের ন্যায় ক্ষত্রিয়

বীর নন। নেই তাঁর পৌরাণিক মাহাত্ম্য, বীরত্ব কঠোরতা। তিনি কোমলতা, মাধুর্য্য ও বিনয়ের অধিকারী। সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে সাধারণ প্রেমিক যুবকের মত তিনি বিরহ বা বিলাপ প্রকাশ করেন —

আজি হইতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ,
আর না যাইব আমি সীতার নিবাস,
আজি হইতে দূরে গেল সে সুখ সন্ধান,
আর না যাইব আমি জানকীর স্থান।।

কৃত্তিবাসের আর এক আবিষ্কার কোমলময়ী, ধরিত্রী কন্যা, বাঙালী বধূ, সংসারে শ্রী ও কল্যানের অধিকারিনী জনক সীতা চরিত্র। পতিপ্রেম তাঁর কাছে পরম ধর্ম। বাল্মীকির সীতা তেজস্বিনী, ক্ষত্রিয় কন্যা, অশোকবনে বীরাঙ্গনা সুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। কৃত্তিবাসের সীতা প্রেমময়ী, সহনশীলা, সতীনারী। তিনি পাতালে প্রবেশ কালেও পতির প্রতি প্রেম জ্ঞাপন করে জানান —

"জন্মে জন্মে প্রভু তুমি হয়ো মোর পতি,
আর কোন জন্মে মোর কারো না দুর্গতি"।।

কৃত্তিবাসের কাব্যের কোথাও শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণের অংশ বলে মনে হয় না। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা, শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ পুত্র, স্বামী হিসাবে, প্রজাপালক হিসাবে, নীতিনির্ধারক হিসাবে তিনি মানুষের প্রতিনিধি। লক্ষ্মণ আদর্শ বাঙালী দেবর, হনুমান বাঙালী ভৃত্য, লব কুশ দেবশিশু নয়, বাঙালী ঘরের দুই সন্তান, তাছাড়া কৃত্তিবাসের কাব্যের উদ্দেশ্য আর্য ও অনার্য শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো নয়, একান্তভাবে বাঙালী জীবন, ধর্ম, অনুশীলন,

চর্চা – চর্যা, আচার – বিশ্বাস দেখানোতেই এ কাব্যের সার্থকতা, এই পুরাণ-আশ্রিত কাহিনী, বাল্মীকি কবি কল্পিত, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য তিনি মানুষ। মানুষের কাব্য রামায়ণ। সীতা মানবী, লক্ষ্মণ সুভ্রাত, মানবতাবাদের এই জন্যেই কৃত্তিবাসের কাব্যের সার্থকতা।

② মহাভারত :–

অনুবাদ শাখার অন্যতম আর এক মহাকাব্য কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', এখানে ব্যাসদেবের 'মহাভারত' এর মত অস্ত্রের গর্জন নেই, রাজনীতির জটিলতা তীব্র নয়, এই ভক্তিরস পারিপার্শ্বিকতাতে মানবরসেরই রূপান্তর হয়ে উঠেছে। এখানে সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দুই সতীনের কলহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বা রক্ত – মাংসের মানবী, জীবনের উপলব্ধিতে, মানবের জয় ঘোষণায় কবির প্রতিভা ব্যস্ত থেকেছে। তাই বাংলা কাব্যের আধুনিকতার অন্যতম পূজারী, নবজাগরণের অন্যতম নায়ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন ——

"হে কাশী কবীশদলে তুমি মহা – পুণ্যবান",

③ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় :–

মালাধর বসু অনূদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে ভক্তিরসের প্রাধান্য, শ্রীকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণা তার আবশ্যক উদ্দেশ্য, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মত সার্বজনীন মালাধরের লেখনীতে প্রবীণ স্থান লাভ করতে পারেনি, তার সত্ত্বেও সেখানে ধ্বনিত, শ্রীরাধিকা জীবনে জিজ্ঞাসার বহু ইঙ্গিত সেখানে ধ্বনিত।

যখন বলেন ——

" অনন্ত বিনলোকে লোক প্রত্যাইতে পারে,
কানু হেন ধন সখী ছাড়িবে কারে"
তখন রক্তমাংসের মানবীর জীবনাকাঙ্ক্ষা অনিবার্য ভাবেই ধ্বনিত হয়।

মঙ্গলকাব্য :-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হোক, আর অনুবাদ সাহিত্যই হোক না কেন, মানব-জীবন, মানুষের জয় ঘোষণার ক্ষেত্রে অসহায়— সেই স্থানে মধ্যযুগের আর এক সাহিত্য আখ্যা মঙ্গলকাব্যের, প্রয়োদম অভাবীর ক্ষেত্র দিকে সাধারন মানুষ আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেবীর চরণে স্মরণ নেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক সঙ্কট এবং সর্বোপরি মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে বিপন্ন মানুষ দেবীর চরণে স্থান নেন, রচিত হয় দেব-দেবীর প্রশস্তিমূলক একশ্রেণীর কাব্য — 'মঙ্গল কাব্য'। মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্য এই শ্রেণীর অন্যতম উদাহরণ।

(1) মনসামঙ্গল কাব্য :-

'মনসামঙ্গল' প্রাচীন মঙ্গলকাব্য, মনসা দেবীর প্রশস্তি মূলক রচনা এটি। তার পূজা প্রচারের কাহিনী এই কাব্য, কিন্তু সেই পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে দেবী মনসার জয় এখানে প্রাধান্য পায় নি, বরং দেব-মানব দ্বন্দ্বের কাব্য হয়ে উঠেছে। 'মনসামঙ্গলে', চম্পক নগরের শ্রেষ্ঠ বণিক চাঁদ সওদাগর। দেবী বণিক চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে এই পূজা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কালে দেবীর জয়ে ভীত

ছিল মানবকুল। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর -ঈশ্বরীর কৃপাপ্রার্থী ভাবত - সেই যুগে মনসার নির্দেশকে উপেক্ষা করে বণিক চাঁদ সওদাগরের জবাব দেন —

"যে হাতে পুজেছি আমি শিব শূলপানি,
সে হাতে কেমনে পূজি চ্যাংমুড়ি কানি"।

এখানে চাঁদ সদাগরের কথা জয় জয় পৌরুষের, দেবী মনসার কুটিল ষড়যন্ত্রের কাছে বারবার চন্দ্রধরকে পরাজয় বরন করতে হল ও তিনি দৃঢ়কন্ঠে মনসার প্রতি ঘৃনা বর্ষন করেছেন বলেছেন —

"কারে কি বলিব আমি নিজ কর্মফল,
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল"।

চন্দ্রধরের মত্যু দিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য মানভতাবাদের জয়গান পরিবেশন করেছে। চন্দ্রধরের পরিবারের প্রত্যেকের কথোপকথন, বুকফাটা কান্না, তীব্র বেদনা, প্রেমাবরই পাঠকের জীবনে আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছে, চন্দ্রধর পিতা হিসাবেও আদর্শ, কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দরের হঠাৎ মৃত্যুতে পিতা চাঁদের শোকে আমাদের শোকাক্রান্ত করে —

"কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর,
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষীন্দর"।

সনকা আদর্শ মাতা, একজন বাঙালী নারী তিনি, পুত্রকে হারিয়ে তার আর্তনাদ আমাদেরকে বেদনাতুর করে তোলে —

"সর্বগুন বর্দ্ধর তিলেক দোষ নাই,
যে বালিশে বর্দ্ধর শৈলেকে লখাই"।

তিনি ভক্তিপ্রানা নারী। এক সরল বাঙালী মাতার মত সংসারের কল্যানের জন্য তিনিও ভক্তিপ্রান চিত্তে মনসার

পূজা করেন। চাঁদের সাথে মনসার বিরোধের তীব্রতা স্পর্শ করে না। এর ফলে একে একে তাকে হারাতে হয় সাত পুত্রকে। প্রতিবাদের ক্ষমতা তার ছিল না। লখীন্দরের মৃত্যুর সংবাদ তাকে পাগলিনী করে, তাই তিনি তার বধূকে দোষারোপ করেন। শুধু সনকা নয়, বেহুলা ও ত্যাগে, প্রেমে, সাহসিকতায়, সংযমে অনন্যা এক নারী। দেবীর ষড়যন্ত্রের সাথে লড়াই করে তিনি তাঁর প্রেমকে জয়ী করেছেন। তিনি বলেছেন —

" সাহসে বিজয়ার পতি,"

তিনি তার কথা ভরেছেন, তবে এই শক্তি মানুষের শক্তি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রেমিক ও স্ত্রী রূপে বেহুলার অনেক বড়ো স্থান রয়েছে।

দেব – দেবী চরিত্র লেখায় এই কাব্যের কবিরা মানব জীবনরস পরিবেশন করেছেন। দেবী মনসা হলেন – কুটিল এবং ষড়যন্ত্রপ্রবণ, মানবীর পরিচ্ছেদেই তাকে পাওয়া যায়, শিব বৃদ্ধ মানুষ তার সংসারের অভাব, কষ্ট, দারিদ্র কূর্মপীড়িত বাঙালী জীবনের প্রতিফলন। 'মনসামঙ্গল' তাই দেবীর পূজা প্রসারের কাহিনী হলেও মানবতার প্রথম সুস্পষ্ট জয়ের ও ধারক – বাহক চাঁদ তার উদ্দেশ্য তাই কাব্য, মানবতাবাদের ধারক – বাহক চাঁদ তার উদ্দেশ্য তাই কবি কালিদাস রায় বলেন —

" তুমি দেবতারো বড় এ যুগের অর্ঘ্য ধরো
বন্দী সার্থ চন্দ্রবীর বীর",

③ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য :–

চৈতন্যপরবর্তী কালে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানবতাবাদ আরো সুস্পষ্ট। হর – গৌরির জীবন কিংবা কালকেতু – ফুল্লরার

আখ্যানে সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। দারিদ্র পীড়িত জীবনের অসহায়ত সেখানে ব্যক্ত হয় গৌরীর উক্তিতে ——

"দারিদ্র পতি যার বিফল জনম তার
দারিদ্র্য পুনরাপি নামে";

পশুর কথায় ধ্বনিত হয় শোষিত নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন ——

"প্রানের দোসর তুই যেন পরলোক,
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক"।

দেবী চণ্ডী পূজা পাওয়ার প্রত্যাশায় মানবী বেশেই উপস্থিত হয়েছেন কালকেতু এবং ধনপতি সদাগরের গৃহে। ফুল্লরা কিংবা খুল্লনাকে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর মানবী রূপটিই প্রকটিত হয়েছে। দেবী হলেও তিনি সন্দেহের উর্দ্ধে উঠতে পারেননি। তাই কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দান করার পর কালকেতুরই অনুরোধে এক ঘড়া ধন বহন করে তার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন, তখন কালকেতুর বারবার পিছন ফিরে দেখার মধ্যে দেবীর দেবীসত্তা ক্ষুন্ন হয়, কালকেতুর সন্দেহ, লোভের বশবর্তী হয়ে দেবী ধনভর্তি ঘড়াটি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এই ধারনাই তো দেবীকে মর্ত্যমানবীতে পালিয়ে যাবে, এই ধারনাই তো দেবীকে মর্ত্যমানবীতে রূপান্তরিত করে দেয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধূর্ত বেনে মুরারি শীল, প্রতিহিংসাপরায়ন ছলচরিত্র ভাঁড়ুদত্ত, কুমন্ত্রণাদাত্রী দাসী দুর্বলা - এরা আমাদেরই চেনা জগতের মানুষ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বত্রই প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের কথা। কালকেতু ও ফুল্লরার জীবন দারিদ্র্য পীড়িত ব্যথিত জীবনের দুঃখে পূর্ণ। এককেই বাস্তব রস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দৈববানী সম্পূর্ন না হলেও অনেকাংশে তিরোহিত হয়েছে।

সুতরাং

③ ধর্মমঙ্গল কাব্য :-

ধর্মের বেদীতলে বসে 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচিত হলেও ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা, রোগ নিরাময় ও প্রজননের দেবতা তিনি। এই কাব্যের বিভিন্ন স্থানে সমাজ ও মানব জীবনের কথা থাকলেও বাস্তবরসের দিক থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল' এর সমগোত্রীয় নয়। তবে কাব্যটির রোমান্টিকতা আছে, এর রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা ও কানাড়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের নানা সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। মহম্মদ খান চরিত্র মর্যাদায় জীবন্ত, লাউসেন মানবিক গুণের অধিকারী।

④ অন্নদামঙ্গল কাব্য :

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' — রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' দেবতা ও মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই কাব্যের লক্ষ্য সাধারণ মানুষ এবং কাব্যের দেব - দেবীরাও দেবতা নন, তারা মানুষ, মর্ত্যকলুষময় মানুষের সুখ - দুঃখ, হাসি - কান্নাই দেবতাদের চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। অন্নপূর্ণার রূপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিহার রূপ - বর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছিলেন নিজের অন্তরের ভক্তির তাগিদে নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে, তবে কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও কাব্যে দেবতার কথা অপেক্ষা মানুষের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। শিব — অন্নপূর্ণা — নারদ — ব্যাসদেব — সবাই সকলকেই ভারতচন্দ্র মানবিক গুণে ভূষিত করেছেন, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিব - বিবাহ, দক্ষযজ্ঞ ও শিবনিন্দা, হর - গৌরীর কথোপ-কথন, হর - গৌরীর বিবাদ - মেনকা, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, ব্যাসের

শিবনিন্দা, ব্যাসের প্রতি অবজ্ঞার নিন্দা, ব্যাসের কৃত অন্যায় প্রতি তিরস্কার প্রভৃতি অংশে দেবতাদের আচরণ পুরোপুরি মানবিক। তাদের আচার-আচরণে মানবিক দোষ-ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরগৌরীর সংসারকে অবলম্বন করে ভারতচন্দ্র একেবারে ঘরোয়া, মানবিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি সেই শিবকে ভিক্ষায় বেরতে হয়েছে। এমন কি তাদের মধ্যে বলতে হয়েছে —

"নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া খাওয়াই,
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই।"

শিবের কাছে গৌরী সুলক্ষণা নন। তাই যুক্তির তীক্ষ্ণ জালে, ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে গৌরী শিবকে বলেন —

"অলক্ষণা সুলক্ষণা যেন হই সে হই,
মোর আসিবার পূর্বকালে কি না কই,,
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে,
গিয়েছিলে মোর তরে কত কি লয়ে।"

শিব-পার্বতীর ঘরোয়া মানবিক জীবনের বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন ভারতচন্দ্র।

☒ ব্যাস কাহিনীতে অন্যা-ব্যাস প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র দেবতার মধ্যে মানবীয় দিকের ছবি এঁকেছেন। বিষ্ণুভক্ত ব্যাস শিবের নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন —

"বিষ্ণুর দেখেছি গুণ বন্দী করেছিল পুন
বিশ্বাস্য যোগ্যতা তার নাই।"

ব্যাস-ও সত্যার পারস্পরিক কথনে মানবীয় বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। অন্নদাকে তিনি জানান —

"আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে নাশিনু
সে মোরে শুদ্ধ বার করে,
সতেজ পারলে দূরে অতএব প্রস্তর করে
এ দুঃখ পরানে নাহি সহে,

অতঃপর ব্যাসের প্রতি উদ্ধত বাণ নিক্ষেপ করে জানান —

"আমার জাতির ধর্মকে ধরিবে তোরে,
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে"

এখানে সত্যা দেবী নন, সামান্য মানবী। 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে ভারতচন্দ্র দেবীকে নামিয়ে এনেছেন ঈশ্বরী পাটনীর নায়ে। সেখানে তিনি স্বয়ং অন্নদার পরিচয় দান, ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া নৌকায় অন্নদার উপস্থিত দেবীর মানবী রূপকেই প্রকাশ করে —

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী"

বৈষ্ণবপদাবলী :-

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অমৃত সংগীত 'বৈষ্ণবপদাবলী'। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রচিত পদাবলী বা গানকে বৈষ্ণব পদাবলী বলে। তবে চৈতন্য বিষয়ক কিছু পদ-ও এই পদাবলীতে অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ন আর শ্রীরাধিকা লক্ষ্মী। তাই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী এক অর্থে ধর্মীয় কাব্য দেব-দেবীর লীলা এর বিষয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, এই বৈষ্ণবদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' গ্রন্থে জানান —

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম"।

শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বৈষ্ণবরা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, ফলে বৈষ্ণবপদাবলী আধ্যাত্মিকতার কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক আবেদনেরও বহুপরিচয় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মানবিকতার অনুসন্ধান করে 'সোনার তরী' কাব্যের বৈষ্ণব কবিতায় বললেন —

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"।

ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে সত্য — সত্যই এমন বিরহ — মিলনের পদ লেখা সম্ভব নয়, আমরা জানি যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখেরা ব্যক্তিজীবনে নারীর প্রেমে ছিলেন মুগ্ধ। আসলে সেই মুগ্ধতা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকে পরিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কালে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব' ছিল না, ফলে তাদের পদে তত্ত্বের বন্ধন নেই। বিদ্যাপতির 'মাথুরে'র পদে রাধার কণ্ঠে যে হাহাকার ধ্বনি পরিবেশিত হয়েছে তা যে কোন বিরহিনী নায়িকার মর্মজ্বালা বলে মনে হয় —

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর"।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদের মধ্যে কোন প্রবল মানুষের আত্মসমালোচনা ও দংশনের কথা প্রকাশিত, চণ্ডীদাসের রাধার কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হয় প্রকৃত প্রেমিকার জীবন উপলব্ধির উক্তি —

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুঃখ,
তোমার লাগিয়া
কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ,

এই সাধনায় দেহত্ব নেই। সহ গ্রাম ও একনিষ্ঠত প্রধান। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদ কাব্য সৌন্দর্যে অতুলনীয়। একজন নারীর রক্তমাংসের আকাঙ্খার তীব্র আকুতি সেখানে ধ্বনিত —

"রূপলাগি আঁখি ঝরে গুনে মন ভোর,
প্রতিঅঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর,,
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।"

এই অনুভূতির মধ্যেও নারীর চাওয়া-পাওয়া প্রধান হয়ে উঠেছে।

বলরাম দাসের কিছু বাৎসল্য রসের পদে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অসাধারণ মানবিক মহিমা লাভ করেছে। এখানে গোপাল ননী চুরি করে খেয়ে ধরা পড়ে গেছেন, তার শাস্তিস্বরূপ মা যশোদা ছাগল দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। এর ফলে অভিমানাহত বালক কৃষ্ণ মানব শিশুর মত জানান —

"বলাই খায়্যাছে ননী   মিছা মোরে বলে রাণি
ভাল মন্দ না কর বিচার,
পরের ছাওয়াল পাইয়া   মায়ে আমেন বাঁধিয়া
কিছু বলি দয়া নাহি তার।"

'শ্রীচৈতন্যজীবনী' কাব্যগুলিতে ও চৈতন্য নামক একজন মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনচরিত লেখা হল। জীবনচরিত এভাবেই মধ্যযুগের কাব্যধারায় মানবতাবাদের বীজ বপন

করলো। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ছাড়া বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস এবং জয়ানন্দের কাব্য প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বনিরপেক্ষ মানুষের জীবন কাব্য হয়ে উঠেছিল, সমকালীন নবদ্বীপের পান্ডিত্য গর্বী ব্রাহ্মণদের অহংকার, বৈষ্ণব - শাক্ত সম্প্রদায়ের বিরোধ, সুলতানি শাসনের নানা দিক, লোকায়ত চিন্তা ধর্মধারার ব্যাপক প্রসার, নবদ্বীপের সমৃদ্ধি এই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের কাব্য হয়ে ওঠে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ জয়ানন্দের কাব্যে জানা যায় চৈতন্যের শেষজীবনের প্রামাণ্য কথা জানা যায়, চৈতন্যের মানব - সুখী কর্মধারা, চৈতন্যের আবির্ভাবেই নব্য- মানবতাবাদের পরিবেশ যা জাগরণ সৃষ্টি হয় বাংলার সমাজও সাহিত্যে,

❀ শাক্তপদাবলী :-

শাক্তপদাবলীর কবিরা জগজ্জননী কালীমাতার উপাসক। তাদের কাব্যেও আছে তন্ত্রধর্মের বহু তত্ত্বকথা। তাঁরা বিষয় বিমুখ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সংসারের মানুষ, এই কাব্যের দুটি শাখা, — ① আগমনী ও বিজয়া, ② ভক্তের আকুতি। উভয় উভয় শ্রেণীর পদেই মানব জীবনের রূপকে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তবু তার অবকাশেই মানব জীবনের কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, উমা সংগীত বাঙালী ঘরোয়া জীবনের কাহিনী হয়ে উঠেছে। আগমনী ও বিজয়া গানে বাৎসল্য রসাশ্রিত মাতৃহৃদয়ের বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতিকে কন্যা রূপে ভজনা করা হয়েছে। কৈলাসপতি শঙ্করের সাথে

বিবাহ হলেও মাতা মেনকার মঙ্গা দূরীভূত হয় না, তিনি গিরিরাজ হিমালয়কে তাগিদ দেন তিনি যেন অবিলম্বে কৈলাসে গিয়ে কন্যা উমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন —

"যাবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে,
ব্যাকুল হৈয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে"।

এখানে মেনকা দেবী নন, বাঙালী মাতা। উমা ঘরে এলে তিনি জানাতে চান —

"কত দেখি উমা, কেমন ছিলে মা
ভিখারি হরের ঘরে?"

হিমালয় এখানে বাঙালী পরিবারের অলস, কর্মবিমুখ পিতা, স্বর্গীয় মাহাত্ম্য তাদের নেই। তাই 'উমাসঙ্গীত' যেন গার্হস্থ্য জীবনের কাব্য। তা আরও শক্তিশালী প্রমাণিত হয় মেনকার নিম্নোক্ত বক্তব্য —

"(গিরি) এবার তোমার উমা এলে আর উমা পাঠব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না,
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয় —
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানবো না"।

শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদের মধ্যে মাতৃসাধনার সাথে সাথে সংসার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের কথা প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখানে ভক্ত মাতার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন 'অমৃত' লাভের জন্য নয় সামাজিক - রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে, তাই তো রামপ্রসাদ জানান —

"কোন অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রীজারি"

মাতের কাছে আশ্রয় চায় পুত্র কিন্তু দেখে উচ্ছৃঙ্খলতা, শোকন, অবিচার বেড়ে যায়। তাই দেবী-কে আঘাত করে কবি বলেন —

"কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখন তো ;

ফলে এই কাব্য মাতা - পুত্রের কথোপকথনের কাব্য হয়ে ওঠে। মাতের প্রতি পুত্রের অভিযোগ ও আশ্রয় প্রার্থনায় ধর্মের সংকীর্ণতা নেই।

আরাকান রাজসভার কাব্য :-

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ সাহিত্য 'আরাকান রাজসভার কাব্য', এই যুগের অন্যতম দুই কবি — সৈয়দ আলাওল ও দৌলত কাজী। দৌলত কাজীর অন্যতম রচনা হল 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী', এটি লৌকিক প্রেমের কাব্য, ময়নালোর - চন্দ্রানী এই ত্রিমুখী প্রেমের কাহিনী এটি। প্রেমের জন্য এসেছে যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ী হয়ে বামনপত্নী চন্দ্রানীকে লাভ করেছেন লোর। আর লোর পত্নী ময়না অপেক্ষার আগুনে দগ্ধ হয়েছে। ময়নমতী সখী মালিনীকে জানান —

মালিনি কি কহব বেদন ওর,

লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর॥

দৌলত কাজীর কাব্য মানব জীবন নির্ভর, অসাধারন কিছু নীতিবচন এই কাব্যকে মানবিক করেছে ——

(ক) "যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল সতন্ত্রনা

অন্তরেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা"॥

④ "জীবন যৌবন ধন না রহিব সর্বক্ষন
অমর হইব উপকারে"।

সৈয়দ আলাওলের লেখা কাব্যগুলি হল — 'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর', 'সেকেন্দার নামা', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমান' ইত্যাদি, এর মধ্যে প্রথম কাব্যটি সার্থক প্রণয় আখ্যান। পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য রত্নসেনের দুঃসাহসিক অভিযান বর্ণনা, পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা, সতীত্বরক্ষার বিবরণ অসম্ভব দক্ষতায় বর্ণিত। এইসব রচনা গুলিতে অলৌকিকতা নেই। কোন কোন স্থানে সুফী ধর্মের কথা বড় হলেও তা উদারতায় পূর্ণ।

❀ মৈমনসিংহ গীতিকা :—

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'লোকসাহিত্য', এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের 'মৈমনসিংহ' জেলায় পাওয়া 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অন্যতম। চন্দ্রকুমার দে এই গীতিকাটি সংগ্রহ করেন। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কেনুয়াসুন্দরী' ইত্যাদি কাব্যে কখনও আবারও হৃদয়, সংস্কার ও প্রেম দ্বন্দ্বে জর্জরিত, প্রথার কাছে, আচারের কাছে, ধর্মের সংকীর্ণতার কাছে প্রেম আঘাত পেয়েছে। মহুয়াও নদের চাঁদ প্রেমকে সফল করার জন্য ছেড়েছে ঘর, ছেড়েছে জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের বন্ধন, শেষপর্যন্ত তাদের জীবনকে কেড়ে নিয়েছে হুমরা বেদের দলবল। তাদের মৃত্যু নয়ে ও প্রেম অমরত্ব লাভ করেছে, তাইতো আমাদের কণ্ঠে আজও ভেসে ওঠে মহুয়া ও নদের চাঁদের সেই স্বর বারংবার

অবিস্মরণীয় উচ্চারণ —

মহুয়া — লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর,
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুব্যা মর ॥
প্রত্যুত্তরে নদের চাঁদ জানায় —

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী,
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি ॥

'মলুয়া' পালায় মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের প্রেম আকর্ষণীয়, মলুয়ার প্রেম সমাজের অবিচারে ব্যর্থ হয়ে যায়। মলুয়ার সতীত্ব অসাধারণ। 'কঙ্ক ও লীলা' কাব্যের নায়ক - নায়িকা একে অপরের কাছে যে ভাষায় প্রেম নিবেদন করে তার কাব্য সৌন্দর্য অতুলনীয়, সর্ব এখানে লীলা ও কঙ্কের প্রেমে বাধা, কঙ্কের বিচ্ছেদে লীলার বিরহ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। করুন নিবেদন ধ্বনিত হয়েছে তার কন্ঠে —

কইও কইও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি,
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী,,
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও,
অলোক চিনাইয়া পথ দেখাইতে আনিও,,

উপসংহার :-

উপসংহারে বলা যায় যে, মানবতাবাদ কথাটি ইতালির রেনেসাঁস জাত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এরকম কোন তীব্র সামাজিক আন্দোলন হয়নি, ফলে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ এই ধারার মধ্য যুগের সাহিত্যে অনুসন্ধান ভুল হবে-মনে রাখতে হবে ধর্ম এবং দেবতাই সেকালে ছিল মূল কথা। কিন্তু সেকথা বলতে গিয়েই কবিরা মানুষের জীবনকে অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই সঙ্গে

এসেছিল মানুষের কথা। যুগ যত এগিয়ে চলে, লেখকের চেতনাও বিবর্তিত হয়, চেতনার বিবর্তন সূত্রেই শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মঙ্গলকাব্য' এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র মানবজীবনরস ভিন্ন ভঙ্গি হয়ে ওঠে, সেই অর্থে এ কথা স্মরণযোগ্য যে ইউরোপে সামাজিক বিবর্তন যত দ্রুত হয়, এ দেশে তা হয়নি, ফলে ইউরোপীয় মানবতাবাদ এর কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মানবতাবাদ এর কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মানবতাবাদ এর অনুসন্ধান ঠিক নয়। এ দেশের সমাজ, মানুষের মন, ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেই বলা যায় এ মানবতাবাদ "দেবতানির্ভর মানবতাবাদ"।

+ সিদ্ধান্ত +

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেবল মাত্র ধর্মীয় ভাবনা নয় অজস্র মানবতাবাদের নিদর্শন রয়েছে, মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য কাব্য মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, প্রভৃতি কাব্যে মানবতাবাদের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, যেমন — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধা - কৃষ্ণ দের চরিত্র হলেও তাদের প্রত্যেক কাহিনী জীবন থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে, মঙ্গল কাব্যে দেব - দেবীদের আচার - আচরনের মানব চরিত্রের কথাই প্রকট হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে জীবনী সাহিত্যের ও চৈতন্যদেব মানব রূপে আবির্ভূত হয়েছে, অতএব আমরা বলতে পারি মানবতাবাদ কে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা কখনোই সম্ভব নয়,

গ্রন্থপঞ্জী

(1) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) → মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড → অসীত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় → পুনর্মুদ্রণ (2015-2016)

(2) সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য — হিরেন চট্টো — পাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল রায়

(3) প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (প্রথম খণ্ড) — ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেন্দ্র মজুমদার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যেসব ব্যাক্তিরা সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ~~কৃতজ্ঞতা জানাই সেই~~ ~~সমস্ত~~ সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার জন্য সাহায্য করেছে। এছাড়াও স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের তাদের পরামর্শ নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে,

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya
EXAMINED

সোমাশ্রী মাইতি
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

নির্দেশকের/শিক্ষকের স্বাক্ষর